নতুনটনের আপেল আর হাবলুর আতা

ড. শামস্ রহমান

ধলেশ্বরী নদী যেখানে বাঁ দিকে বেঁকে দক্ষিনে ধাবিত হয়েছে, ঠিক তার পশ্চিম পাড় ঘেঁসেই যে গাঁ, তার নাম মালঞ্চ। পাড় ভাঙ্গা নদীর জেগে উঠা চরই এ গাঁয়ের ভূখন্ড - তবু নাম মালঞ্চ। হাবলু এ গাঁয়ের বাসিন্দা। বাড়ীর পাশেই মাঠ; তারপরই স্কুল। নাম আদর্শ্য বিদ্যাপাঠ। এদত অঞ্চলে এটাই সবচেয়ে পুরাতন স্কুল। ১৭৯৯ সনে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সন্তোসের জমিদার। হাবলু এ স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

মালঞ্চের দু' গাঁ পরেই রসুলপুর। সেখানে হাবলুর দাদুর বাড়ী। ছুটি হলেই সে ছুটে আসে দাদুর বাড়ী। বাড়ীর সামনে উঠান। উঠান পেরুলেই টানা বারান্দা সংলগ্ন দোচালা ঘর। ঘরের পিছনে মস্তবড় এক বাগান। দাদুর জোয়ান বয়সে নিজ হাতে গড়া এ বাগান। বাগানকে ঘিরে সকাল বিকাল এখনো তার সে কি পরিশ্রম! আড়াই বিঘা জমির উপর এ বাগানের বাঁ দিক জুড়ে বেগুনের টাল। মাঝে খানিকটা শব্জি বাগান। আর ডান দিক ঘেঁসে সারি সারি আতাফলের গাছ। এ সব মিলেই দাদুর বাগান।

এখন স্কুল শীতের ছুটি। প্রতি বছরের মত ছুটি কাটাতে হাবলু এবারও ছুটে এসেছে দাদুর বাড়ী। সঙ্গে ফতুয়া-লুঙ্গি আর গামছা সহ বেশ কয়েকটি সাধারণ বিজ্ঞানের বই দিয়ে ঠাসা এক কাঁধের ব্যাগ। বিজ্ঞান হাবলুর প্রিয় পাঠ্য বিষয়। দাদুর বাগানও তার অতি প্রিয়। প্রতিদিন দিনের অনেকটা সময় সে বাগানে কাটায়। সকালে গাছে গাছে পাখির শব্দ; বিকেলের পরন্ত সূর্যের লাল আভা এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করে বাগানকে ঘিরে। পাখির শব্দে হাবলু যেমন মৃদু নৃত্যের ছন্দ খুঁজে পায়, বেলা শেষে পরন্ত সূর্যের আভা তাকে দারুন ভাবায়। তবে এ বছর বাগানটা কেমন যেন অন্যরকম। ভিন্ন স্বাদে ভরা। আরও প্রাণবন্ত, আগের তুলনায় আরও মায়াময়।

এবারই প্রথম আতাগাছে আতা এসেছে। অসংখ্য আতা, ঝুলে আছে একের পর এক। পতাকা-সবুজ ছোট-বড় আতা, পাতায় ঢাকা আধোঁ দেখা, আধোঁ না-দেখা আতা, দেখায় বেশ। সকালে সূর্য যখন পূর্বাকাশে মাটি ছুঁই-ছুঁই অবস্থান থেকে খানিকটা উপরে উঠে আসে; হাবলু তখন ডালা ভরে খই, আর হাত ভরে বই নিয়ে বাগানে বসে।

সেদিনের সকালও কোন ব্যতিক্রম ছিল না। হাবলু বাগানে এসে বসে। হাতে খই আর সাধারণ বিজ্ঞানের একটি গল্পের বই। পাতা উলটাতে উলটাতে মধ্যাকর্ষণ বিষয়ক অধ্যায়টি তাকে আকর্ষণ করে। এখানেই নতুনটনের সাথে তার পরিচয়। নতুনটনের মাথায় আপেল পড়ার গল্প পড়ে হাবলু তো হেসেই খুন। হঠাৎ উপরে তাকায়। দেখে ঝুলে থাকা অসংখ্য আতা। আপেল মাথায় না পরে, কেন ঊর্ধাকাশে উড়ে গেল না, সে ভাবনায় হাবলু মোটেই ভাবিত নয়। 'নতুনটনের মাথায় পড়ে আপেলটা কি ফেটে গেল? না কি সে ব্যথা পেল? নিশ্চয়ই টসটসে পাকা ছিল? গাছ-পাকার অন্য এক স্বাদ'। এ ভাবনাতে হাবলু আচছন্ন থাকে অনেকটা সময়। হঠাৎ আবার উপরে তাকায়। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে - 'যদি কোন আতা বোটা খসে মাথায় পড়ে, তবে কেমন হবে?'

কখনো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে। কখনো রং তুলিতে আঁকে - ঝুলে থাকা আতা। সবুজ রঙ্গে ভরে তুলে পাতার পর পাতা। টাঙ্গিয়ে রাখে নিজ ঘরে, এক এক করে। শয়নে-স্বপনে এখন শুধুই আতা। এত বড়-বড়, এত সুন্দর আতা, এত কাছে থেকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখার সৌভাগ্য হাবলুর এটাই প্রথম। 'কবে পাকবে আতা? বোটা খসে পড়বে কবে?' - এগুলোই ভাবনা এখন।

এক দুই তিন করে কাটে বেশ ক'দিন। তারপর কেটে যায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ। কিন্তু আতা পাকার কোন লক্ষণই নেই। 'ছুটি যে ফুরিয়ে এলো! আতার কি হলো? পাকবে না বুঝি আতা? তাহলে কেমন হবে?' অস্থিরতায় চিবুক চুয়ে পরে মাথার ঘাম। তবু আশায় বাঁধে বুক। কাটে আরও ক'দিন। ভাবে - 'গাছ-পাকা আতা না জানি কি মজা! নিশ্চয়ই সেই শত শত বছর পূর্বে নাতিশীতষ্ণ জলবায়ুতে বেড়ে উঠা আর গ্রীষ্মের আগমনে বোটা খসে পড়া নতুনটনের আপেলের মত। ভাবে - গাছ-পাকা বোটা খসে পড়া আতা খাবে, আর তা বিলিয়ে দেবে, এ গাঁয়ের প্রত্যেক ঘরে ঘরে। দাদুর সুস্বাদু আতার এক একটি বীজ থেকে জন্ম নেবে লক্ষ আতা'। মূহুর্তে ফিরে আসে নিজের মাঝে- 'আতাতো পাকেনি এখনো! সময়তো বেশী নেই আর। এত স্বল্পকালে কিভাবে পাকাবে সে আতা?'

দাদুর দোচালা ঘরের এক কোণায় পাতা 'রাণী' আর 'দ্বিগুনের' মাঝামাঝি মাপের এক চৌকি। তাতে কাঁথা আর বালিশের স্তুপ। দীর্ঘ দিন খার জুটেনি এদের ভাগ্যে। তাই দিনে দিনে বালিসের ওসার গুলো গায়ের ঘাম আর মাথার তেলের আস্তরে আজ অনেকটাই অসার। ঘরের বাকি অর্ধেকটা জুড়ে মাচা। তার উপর সারি সারি হরেক রকমের মাটির হাড়ি। এগুলোর মাঝখানে চাটাইয়ের তৈরী মস্তবড় চালের এক আরত। সারা বছরের আউসে ভরা। হাবলু ভাবে দ্রুত আতা পাকানোর এটাই মূখ্যম পন্থা। মায়ের গর্ভের উষ্ণতায় শিশু যেমন হয়ে উঠে শক্ত-সমত্ত; তেমনি নিশ্চয়ই ঢেকি-ছাটা আউসের ওমে তাঁজা-কাঁচা আতা পাকবে দ্রুত।

যে কথা সেই কাজ। পরের দিন ভোর না হতেই হাবলু বাগানে এসে হাজির। আতা আর পাতা তখনো শিশিরে মাখা। পাতা আর আতায় হাবলুর হাতের ছোঁয়ায় শিশির বিন্দু জল-ফোটা হয়ে ঝড়ে পরে চোখে-মুখে। এ এক অদ্ভুত অনুভুতি! স্নিগ্ধ মায়াময় হাসিতে ভরে উঠে হাবলুর মুখমন্ডল। দেখে শত শত আতা। তা থেকে বেছে বেছে চারটি আতা শক্ত বোটা ছিঁড়ে এক দৌড়ে ছুটে যায় দাদুর ঘরের মাচার ধারে। যতন করে এক এক করে পুঁতে রাখে আরতের আউসের গভীরে।

এখন আর বিজ্ঞানের গল্পে মন বসে না। আহার-নিদ্রা ভাল লাগে না। বাগানে বসলেও হাবলুর মন পরে থাকে আরতে - 'কখন পাকবে আতা?' অধর্য্যে যখন-তখন ছুঁটে যায় আরতের পানে। আতাগুলো এক এক করে বেড় করে খুব যতনে । মেলে ধরে ঘরের আলোয়। মৃদু চাপে আঁচ করে, আতা - পেকেছে কি পাকেনি! মনে মনে ভাবে -'আতা পাকানো কি এতই কঠিন?' আবার স্বযত্নে এক এক করে পুঁতে রাখে আউসের গভীরে। 'কবে পাকবে আতা?' অপেক্ষায় কাটে কাল।

এদিকে ছুটি প্রায় শেষ। এরই মাঝে শীতের তীব্রতাও কমে এসেছে কিছুটা। এবার মালঞ্চে ফেরার পালা। সকাল থেকেই হাবলুর মনটা ভীষন ভারী। নাওয়া নেই, খাওনা নেই, হাবলুকে তখন ছন্নছাড়া বাউলের মত দেখায়। কখনো উঠান জুড়ে পায়চারি; কখনো বাগানে শুধুই বসে থাকা। এভাবেই কাটে সারাদিন। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে রাতে বিছানায় যায়। রং তুলিতে আঁকা ঘরের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা

পতাকা-সবুজ আতার দিকে তাকিয়ে থাকে এক গভীর দৃশটিতে। দেখতে দেখতে কোন এক মূহুর্তে নিজের অজান্তে হাবলু ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন ভোরে উঠে যায় ঠিকই; তবে উদাসিন দেখায় তাকে। আরতে রাখা আতার কথা মনে পড়ে; তবে ভিরে না কাছে। আতাকে যে এতকাল মান করেছে, আজ তার সাথে হাবলুর এ কিসের অভিমান? থমকে গেছে আজ তার সেই চঞ্চল চলাচল। নেই সেই দৃটির প্রখরতা; চোখে-মুখে শুধুই অমনোযোগী মনোযোগ।

রসুলপুর থেকে মালঞ্চ, অনেকটাই পথ। সকাল-সকাল যাত্রা করা দরকার! তবুও আজ প্রভাতে কোন কিছুতেই তেমন তাড়া নেই হাবলুর। ধীরে ধীরে গামছা, লুঙ্গি, ফতুয়া ব্যাগে ভরে। তারপর বিদায়ের জন্য দোচালার দরজায় পা রাখতেই অনুভব করে দাদুর ঘরময় এক মিষ্টি গন্ধ। ঘন-সুগন্ধি ঘ্রাণ চারিদিকে সৃষ্টি করেছে এক মায়াময় পরবেশ। কোথা থেকে এ সুগন্ধ, তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয়নি হাবলুর। ছুঁটে যায় মাচায়। উপচে পরা আউসের আরত থেকে এক এক করে বের করে আর উঁচ্চ কণ্ঠে বলে -'গফুর, লতা তোরা দেখে যা, পেকেছে আতা'। দুহাতের মুঠোয় নিয়ে ভূ-গোলকের মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে আর প্রাণ ভরে ঘ্রাণ নেয়। হাতে, আঙ্গুলে, দেহের যেখানেই আতার স্পর্শ, সেখানেই ঝড়িয়ে যায় মিষ্টি গন্ধ। দিনের আলোতে নিয়ে আসে। বারান্দায় পাতা চৌকাঠের উপর সযত্নে সারি বেধেঁ রাখে। হাবলুর ডাকে এরই মাঝে পাড়ার ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা বাড়ীর উঠানে এসে হাজির। একটা আতা ভেঙ্গে হাবলু সবাইকে দেয় এবং নিজে খায়। তার পর পরই হাবলুকে কেন যেন একটু চিন্তিত দেখায়। চোখে মুখে বিষন্নের ছাপ। কিন্তু কেন? হঠাৎ কি হলো হাবলুর? যে আতার জন্য এত অপেক্ষা, যে আতার এত ঘ্রাণ! হাবলু নীচু কণ্ঠে নিজে নিজে বলে- 'ঘ্রাণে যত মিষ্টি, খেতে ঠিক তত নয়। তবে কি গাছ-পাকা আতা এর চেয়ে বেশী মিষ্টি? শত শত বছর পূর্বে নাতিশীতষ্ণ জলবায়ুতে বেড়ে উঠা আর গ্রীষ্মের আগমনে গাছ থেকে পতিত আপেলের সুগন্ধে দাদুর ঘরের মতই কি ভরে উঠেছিল নতুনটনের বাগান? সেদিনের সে আপালের স্বাদে-সুগন্ধে ছিল কি কোন তফাৎ? তবে কি প্রাকৃতিক বিবর্তনই একমাত্র পথ? তবে? কত কালের এ প্রতিক্ষা?'

এ দিকে বেলা অনেকটাই গড়িয়ে গেছে। আজ সূর্যও বেশ প্রখর। হাবলু দৌড়ে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলায়, আর পা বাড়ায় বাড়ীর পথে। ধুলো-পথ পাড়ি দিয়ে বাড়ী ফেরার কথা মনে হতেই ধু ধু করে উঠে হাবলুর বুক। এমনিতেই বিষন্ন, কিছুদূর পথ চলতেই ক্লান্তি লাগে দেহে। হঠাৎ খাঁ-খাঁ বালির ধারে দেখে ছোট্ট এক জলাধার। তাতে টলমলে জল। শেষ শীতের মধ্যদিনের প্রখর রশ্মির ছোঁয়ায় ঝিকিমিকি করে জলাধারের জল। হাবলু আলতো ভাবে আঙ্গুল বুলায় তাতে। তখন তার ঠোটের কোনে ভেসে উঠে এক স্নিগ্ধ হাসি। হাবলু বলে - 'আবার আসবো ফিরে, দাদুর রসুলপুরে'।

সাংহাই, ২৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০১০